রেশমকীটের রোগবালাই দমন:লক্ষণ,রোগ প্রাদুর্ভাবের সময় এবং প্রতিকারের উপায়

রেশম শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতির পতে যে সকল বাধা ও বিপত্তি আছে, রেশম পোকার রোগ তার মধ্যে উলেস্নখযোগ্য। এ শিল্পে উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই রোগ হয়। তবে রোগের ব্যাপকতা ওপ্রকৃতি এক রকম নয় । আবহাওয়া ও পরিবেশই মুলত: এর প্রধান কারণ। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ভাইরাস জনিত রসা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। বাংলাদেশ একটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ । এদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ অন্য দেশ থেকে আলাদা। ফলে রোগের প্রকার,ধরণ ও ব্যাকতা ভিন্ন। রশমকীটের রোগবালাই লক্ষণ, পরিশের উপর প্রভাব ক্ষতির পরিমান ও প্রতিরোধের উপায় নিমেণ উলেস্নখ করা হলো-

পেব্রিন (Pabrine)

পেব্রিন রেশম পোকার মারাত্বক রোগ। এই রোগের জীবাণু এককোষী ক্ষুদ্র প্রাণী। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Nosema bombycis* রেশম পোকার অন্যতম রোগ পেব্রিনকে বাংলাদেশে ‘‘কটা’’ রোগ বলা হয়। এই রোগ রেশম গুটি উৎপাদনে এক বিরাট অন্তরায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রোগ ইউরোপ রেশম শিল্প ধ্বংস করে। বিজ্ঞানী লুই পাস্তর সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা প্রথম এই রোগের জীবাণু আবিস্কার করেন এবং এই রোগের প্রতিরোধের কিছু নীতি দিয়ে গিয়েছিলেন যা আজও পৃথিবীর সকল দেশে পালিত হচ্ছে।

নজিমা বোমবায়সিয় *Nosema bombycis* নামক এককোষী জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত যা রেশম পোকার দেহে গোলমরিচের মত দাগ দেখা যায় তাকে Pabrine পেব্রিন রোগ বলা হয়।

পেব্রিন রোগের বিস্তারঃ এই রোগ দুই ভাগে ছাড়ায় যথা-

(ক) মুখের মাধ্যমে (খাদ্যের সাহায্যে পাতার মাধ্যমে)।
(খ) ডিমের মাধ্যমে।

মুখের মাধ্যমে (খাদ্যের সাহায্যেপাতার মাধ্যমে বিস্তার)ঃ পলূপালন কালে পলুপালন ঘর পলুপালন সরঞ্জামাদি অথবা ডালায় মরা পোকা থেকে তুঁত পাতায় পেব্রিন রোগের জীবাণু

মিশে যায়। জীবাণু সহ পাতা খেয়ে সুস্থ্য পোকায় পেব্রিন রোগ বিস্তার লাভ করে। পাতার মাধ্যমে বিস্তারকে গৌণ বিস্তারর বলে।

ডিমের মাধ্যমে বিস্তারঃ পঞ্চম অবস্থায় শেষের দিকে পেব্রিন রোগে আক্রান্ত পলু গুটি করবে কিন্তু মা মথের দেয়া সব ডিম পেব্রিন রোগাক্রান্ত হবে এবং মুখানো পলুগুলোতে পেব্রিন রোগ দেখা দিবে।

পেব্রিন রোগের লক্ষণঃ রেশম প্রজাতির বিভিন্ন পর্যায়ে পেব্রিনের বিভিন্ন লক্ষণগুলো হল যথা-

ডিমের অবস্থায় লক্ষণঃ

- ডিম স্তুপাকার দেয়।
- ডিমের আঠালো পদার্থ কম থাকে।
- বেশি ভাগ ডিম অনিষিক্ত বা মরা হয় এবং সংখ্যায় কম হচ্ছে।
- ডিমের রং ফেঁকাসে দেখায়।

পলু অবস্থায় লক্ষণঃ

- ডালায় ছোট বড় বিভিন্ন আকারের পলু দেখা যায়।
- দেরিতে রহায় যায় এবং দেরিতে খোলস ছাড়ে।
- দেহে মরিচের মত কালো দাগ দেখা যায়।
- পলু দেখতে কটা বা ছাই রংঙের হয়।

পিউপা বা মুককীট অবস্থায় লক্ষণঃ

- পিউপা থলথলে নরম হয়।
- পিউপায় কালো কালো দাগ দেখা যায়।
- আক্রান্তের চরম অবস্থায় পিউপা মথে পরিণত হতে পারে না।

মথ অবস্থায় লক্ষণঃ

- মথের দেহে আঁশ সহজেই ঝরে পড়ে।
- আক্রান্ত মথের পা কুঁকড়ে যায়, পাখা মেলতে পারে না।
- সঙ্গমে অনীহা প্রকাশ করে এবং সঙ্গম ক্ষনস্থায়ী হয়।

প্রাদুর্ভাবের সময়:যে কোন মৌসুমে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

ক্ষতির পরিমান: (০-১০০)%

প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণের উপায়ঃ নিম্নোক্ত উপায়ে পেব্রিন নিয়ন্ত্রন করা হয়-

- পলূপালন শেষে ও পলুপালন শুরু করার পূর্বে সম্পূর্ণ পলুঘর এবং পলুপালনের সরঞ্জামাদি ভালভাবে বিশোধন করতে হবে।
- রোগমুক্ত ডিম দিয়ে পলুপালন করতে হবে।
- পলুপালনের সরঞ্জমাদি কড়া রোদ্রে ৬-৭ ঘন্টা শুকিয়ে নিলে জীবাণু ধ্বংস হয়।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল না করে তবে শতকরা ২ ভাগ ফরমালিন দ্রবন দিয়ে পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি বিশোধন করতে হবে।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল করলে শতকরা ৫ ভাগ ব্লিচিং পাউডার দ্রবন দিয়ে বিশোধন করতে হবে।
- ধার করা ডালা চন্দ্রকী বিশোধন না করে ব্যবহার করা যাবে না।
- ডিম যথাযথভাবে বিশোধন করে নিতে হবে।
- রহার পরে বিশোধন করা ডালা বদলিয়ে দিতে হবে।

পেব্রিন রোগের জীবাণু এ রোগের প্রধান উৎস। এ কারণে পলুপালন চলাকালীন সময় দেরিতে রহায় যাওয়া এবং রহা থেকে Iঠা পলু, রোগাক্রান্ত ও মরা পলু এবং মা-মথ পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

রেশম কীটের ব্যাকটেরিয়া রোগ (কালশিরা)

রেশম পলুর রোগগুলোর মধ্যে কালশিরা বা ফ্লাসারি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়া একটি অতিক্ষুদ্র এককোষী জীব। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের দেখতে হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এ রোগ সাধারণত জ্যৈষ্ঠা এবং ভাদুরী বন্দে বেশি হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০-৪০ ভাগ রেশম পলু এ রোগে আক্রান্ত হয়।

ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ তিন ধরণের হয়ে থাকে। এগুলো হলো যথা-

(১) সেপ্টিসোমিয়া রোগ।
(২) গ্যাসট্রো-এনটারিক রোগ।
(৩) সটো ব্যাকটেরিয়াম টক্সিকোসিক রোগ।

কালশিরা/ফ্লাচারী রোগের কারণঃ নিম্নোক্ত কারণে ফ্লাচারী দেখা যায়।

- উষ্ণ তাপমাত্রা, উষ্ণ আর্দ্রতা এবং পলুঘরে বায়ু চলাচল সঠিক না হওয়া।
- ময়লা, পাকা, ভিজা, গাঁজা এবং বয়স উপযোগী না এমন তুঁতপাতা খাওয়ানো।
- ডালাতে অধিক পাতা দেওয়া।
- ডালাতে পলু ঘন রাখা।
- পলুর পাকস্থলীতে ক্ষারত্ব হ্রাস পাওয়া।

রোগের লক্ষণঃ নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো পলুর দেহে দেখা যায়-

- পলুর ক্ষুধা মন্দা ও অলসভাব।
- পলুর দেহ নরম হয়ে যাওয়া।
- মুখ দিয়ে বাদামী রঙ্গের বমি হয়।
- নরম ও আঠালো মল ত্যাগ করা।
- সঠিকভাবে রহাতে না যাওয়া।
- মৃত পলূ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ানো।
- পলুর গলার কাছে ৪-৬ খন্ডাংশ গাঢ় পীত বর্ণের হয়।
- পলুর পিঠে রক্তবাহী নালী মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত স্বচ্ছ কাল বর্ণের হয়।
- পলুর দেহ সোজা হয়ে যায় এবং থোরাক্স ফুলে যায়।

প্রাদুর্ভাবের সময়: গ্রীষ্ম মৌসুমে এ রোগ বেশি হয়।

ক্ষতির পরিমান: (১০-৪০)%

প্রতিরোধ ও প্রতিকারঃ

- পলুঘর ও পলুপালন সামগ্রী ভালভাবে বিশোধন করতে হবে।
- পলুঘরে পরিমিত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ।
- সতেজ ও উপযুক্ত পাতা সরবরাহ করা।
- গাদাগাদি করে পাতা সংরক্ষণ করা যাবে না।
- নিয়মিতভাবে কাঁসার করতে হবে।
- যথেষ্ট বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ডিম সঠিকভাবে সুপ্তিকরণ (Incubation).
- দেহে যেন ক্ষতের সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- তুঁত গাছের কীট দমন করতে হবে।
- রোগাক্রানত পলু দেখা মাত্র ডালা থেকে সরিয়ে পুতে ফেলা।

- পলুর বেড ও পলুর দেহ নিয়মিত বিশোধনের ব্যবস্থা নেয়া।

ব্যাকটেরিয়া বাতাস পানি ও মাটি সর্বত্রই থাকতে পারে- তাই কোন ভাবে পলুর দেহে ক্ষতের সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ভাইরাস জনিত রসা রোগ

রেশম শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতির পতে যে সকল বাধা ও বিপত্তি আছে, রেশম পোকার রোগ তার মধ্যে উলেস্নখযোগ্য। এ শিল্পে উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই রোগ হয়। তবে রোগের ব্যাপকতা ওপ্রকৃতি এক রকম নয়। আবহাওয়া ও পরিবেশই মুলত: এর প্রধান কারণ। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ভাইরাস জনিত রসা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। বাংলাদেশ একটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ । এদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ অন্য দেশ থেকে আলাদা। ফলে রোগের প্রকার,ধরণ ও ব্যাকতা ভিন্ন। রশমকীটের রোগবালাই লক্ষণ, পরিশের উপর প্রভাব ক্ষতির পরিমান ও প্রতিরোধের উপায় নিমেণ উলেস্নখ করা হলো-

রোগের কারণ সমূহ:

- জীবাণু গুলো মুখের অথবা ক্ষতের মাধ্যমে পলুর দেহে প্রবেশ করে।
- উষ্ণ তাপমাত্রা,নিমণ আর্দ্রতা এবং পলুঘরে বায়ু চলাচল সঠিক না হওয়া।
- ময়লা, পাকা, ভিজা, গাঁজা এবং বয়স উপযোগী না এমন তুঁতপাতা খাওয়ানো।
- ডালাতে অধিক পাতা দেওয়া।
- ডালাতে পলু ঘন রাখা।
- খাদ্য নালীতে পাচক রসে পলিহেড্রো গরে যায় ও ভাইরাস গুলো বেরিয়ে আসে।
- এদের রক্তে বা পুজে প্রচুর পরিমানে ভাইরাস জীবাণু থাকে।

রোগের লক্ষণ সমুহ:

- আক্রান্ত পোকার দেহ হলুদ হয়।
- পলুর গাট গুলি ফুলে যায়।
- পলুর দেহে সামান্য আঘাতে পুজের মত রস বের হয়।
- পলু ছটপট করে ও ঢালার ধার বেয়ে চলাচল করে।

প্রাদুর্ভাবের সময়: বর্ষা মৌসুমে এ রোগ বেশি হয়।

ক্ষতির পরিমান : ১৫-৬০%

প্রতিরোধের উপায়:

- পলূপালন শেষে ও পলুপালন শুরু করার পূর্বে সম্পূর্ণ পলুঘর এবং পলুপালনের সরঞ্জামাদি ভালভাবে বিশোধন করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পলুকে বেছে চুন/পরমালিন যুক্ত পানিতে ফেলতে হবে।
- পলুপালনের সরঞ্জমাদি কড়া রোদ্রে ৬-৭ ঘন্টা শুকিয়ে নিলে জীবাণু ধ্বংস হয়।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল না করে তবে শতকরা ২ ভাগ ফরমালিন দ্রবন দিয়ে পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি বিশোধন করতে হবে।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল করলে শতকরা ৫ ভাগ ব্লিচিং পাউডার দ্রবন দিয়ে বিশোধন করতে হবে।
- ধার করা ডালা চন্দ্রকী বিশোধন না করে ব্যবহার করা যাবে না।
- ডিম যথাযথভাবে বিশোধন করে নিতে হবে।
- রহার পরে বিশোধন করা ডালা বদলিয়ে দিতে হবে।
- নিয়মিত ভাবে কাঁসার করতে হবে।
- অতিরিক্ত কাঁচা,বাসি,ভেজা আথবা কড়া পাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে না।
- পলুঘরে পরিমিত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ।
- সতেজ ও উপযুক্ত পাতা সরবরাহ করা।
- ডিম সঠিকভাবে সুপ্তিকরণ (Incubation).
- তুঁত গাছের কীট দমন করতে হবে।
- রোগাক্রানত পলু দেখা মাত্র ডালা থেকে সরিয়ে পুতে ফেলা।
- পলুর বেড ও পলুর দেহ নিয়মিত বিশোধনের ব্যবস্থা নেয়া।
- রোগ দেখা দিরে বিশোধক ‘‘ পলু পাউডার’’ ব্যবহার করতে হবে।

ছত্রাক জনিত মাসকারডিন/চুনাকাঠি রোগ

মাসকারডিন ছত্রাক জনিত রোগ। সাধারনত্ রোগ চুনাকাঠি নামে পরিচিত। এ রোগে আক্রামন্ত মৃত পলু খড়িমাটির মত শক্ত হয়ে বেডে পড়ে থকে। অল্প তাপমাত্রা ও অধিক আর্দ্রতায় মাসকারডিন/ চুনাকাঠি রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

রোগের কারণ সমূহ:

- সাদা চুনাকাঠি রেশম পলুর একটি অত্যামন্ত ছোঁয়াচে রোগ।
- এ রোগের জীবাণু গুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

- ২৮* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৯০-১০০% আদ্রতায় এ সমসস্ত জীবাণু গুলো ত্বকের মাধ্যমে অথবা ক্ষতের দ্বারা সুস্থ্য পলুর দেহে রোগের সৃষ্টি করে থাকে।
- দেহের ভিতর পাতরা সুতার মত জারিকা সৃষ্টি করে।
- এ রোগের প্রজাতির নাম *Beauveria bassiana*।

রোগের লক্ষণ সমুহ:

- প্রথম অবস্থায় এ রোগ ধরা যায় না কিন্তু রোগ যখন বৃদ্ধি পায় তখন পলুর দেহে তৈলাক্ত দাগ দেখা যায়।
- রোগাক্রান্ত পলু বমি করে ও নরম মল ত্যাগ করে।
- ঠিক মরার পরপরই পলুর দেহে চাপ দিলে পন্জের মত মনে হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শক্ত হয়ে যায়।
- রোগাক্রান্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ২-৩ দিন সময় লাগে।
- এরার ২/১ পরেই পলুর দেহ সাদা পাউডারের মত কনিডিয়ায় ভরে যায়।
- অক্রান্ত পিউপার দেহ কুঁচকে যায় এবং নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। গাটে গাটে বীজকণাবা কনিডিয়ার বৃদ্ধি ঘটে।
- অক্রান্ত মথের দেহ শক্ত হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে।

প্রাদুর্ভাবের সময়: শীত মৌসুমের পূর্বে ও পরে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

ক্ষতির পরিমান : ১০-৩০%

প্রতিরোধের উপায়:

- পলূপালন শেষে ও পলুপালন শুরু করার পূর্বে সম্পূর্ণ পলুঘর এবং পলুপালনের সরঞ্জামাদি ভালভাবে বিশোধন করতে হবে।
- রোগমুক্ত ডিম দিয়ে পলুপালন করতে হবে।
- পলুপালনের সরঞ্জমাদি কড়া রোদ্রে ৬-৭ ঘন্টা শুকিয়ে নিলে জীবাণু ধ্বংস হয়।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল না করে তবে শতকরা ২ ভাগ ফরমালিন দ্রবন দিয়ে পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি বিশোধন করতে হবে।
- জানালা-দরজা বন্দের পরে যদি বাতাস চলাচল করলে শতকরা ৫ ভাগ ব্লিচিং পাউডার দ্রবন দিয়ে বিশোধন করতে হবে।
- ধার করা ডালা চন্দ্রকী বিশোধন না করে ব্যবহার করা যাবে না।
- ডিম যথাযথভাবে বিশোধন করে নিতে হবে।
- রহার পরে বিশোধন করা ডালা বদলিয়ে দিতে হবে।
- কনিডিয়া জন্মানোর পুর্বেই রোগাক্রান্ত পলুগুলোকে তুলে চুনের পানিতে ফেলতে হবে।

- নিয়মিত কাঁসার করতে হবে। অতিরিক্ত আদ্রতায় এ রোগ সৃষ্টির সহায়ক তাই আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে ডালায় ‘‘পলু পাউডার’’ব্যবহার করতে হবে।
- প্রযোজনে ফরমালিন চাপ ব্যবহার করতে হবে। ১ম অবস্থায় পলুর জন্য শতকরা ০.৪ ভাগ, ২য় অবস্থায় পলুর জন্য শতকরা ০.৫ ভাগ,৩য় অবস্থায় পলুর জন্য শতকরা ০.৬ ভাগ,৪র্থ অবস্থায় পলুর জন্য শতকরা ০.৭ ভাগ এবং ৫ম অবস্থায় পলুর জন্য শতকরা ০.৮ ভাগ। মিশ্রনের পরিমান -১০ ভাগ আধা পোড়া ধানের তুষের সাথে ১ ভাগ ফরমালিন দ্রবন।
- তুঁত গাছের কীট ধংস করতে হবে।
- গন্ধক পুড়িয়ে পলু ঘরকে জীবাণু মুক্ত করা হয়।

উজি মাছি দমনে উজিনাশ

রেশমকীটের বহু ধরণের কীটশত্রু আছে। এদের মধ্যে প্রধান কীটশত্রু উজি মাছি। এরা ছোঁয়াচে রোগ নয় কারণ শুধুমাত্র যে পলুকে আক্রমন করে তাকেই ক্ষতি করে থাকে। উজি মাছি পলু পোকার ক্ষতি বিভিন্নভাবে করে থাকে। তাই এই মাছি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিচে এদের বর্ণনা করা হলো।

উজি মাছিঃ উজি মাছি রেশম পোকা বা পলু পোকার জাতশত্রু। আমাদের দেশে পলুর প্রধান কীটশত্রু উজি মাছি। এই মাছির বৈজ্ঞানিক নাম *Tricholyga Bombycis/Exorista Bombycis* প্রভৃতি। এ মাছি রেশম পোকাকে আক্রমন করে ফসলের সর্বনাশ ঘটায়। এই মাছি জ্যৈষ্ঠাবন্দে পলুর সর্বচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এই মাছি দ্বারা প্রতিবছর রেশমের ক্ষতির পরিমান ১০-৩০ ভাগ। একে ‘‘মাছি কাটা’’ (Maggote Disease) রোগও বলা হয়ে থাকে। ২০০৩ সালে জ্যৈষ্ঠা বন্দে ভোলাহাট এলাকায় ব্যাপক উজি মাছির আক্রমনে শতকরা ৮০ ভাগের উপর রেশমগুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এ ধরণের অবস্থা বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে ও পূর্বেও দেখা গিয়েছে। কোন এলাকায় ধারাবাহিক পলুপালন করা হলে উজি মাছি পর পর পোশক (Host) বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায়। যে কারণে ধারাবাহিকভাবে পলুপালন এলাকায় এর প্রকোপ ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জীবনচক্রঃ রেশম পোকার ন্যায় উজি মাছির জীবন চক্রেও চারটি পর্যায়ে রয়েছে ডিম, ম্যাগট (শুককীট), পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ মাছি। একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মাছি ২ থেকে ৩ দিনে ৩০০-

১০০০ টি পর্যন্ত ডিম দেয়। ২-৪ দিন বয়সে মাছি সর্বোচ্চ পরিমান ডিম দেয়। ডিমের রং ঘিয়ে, সাদাটে ও চকচকে হয়। ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। একে ‘‘ম্যাগট’’ বলে। ম্যাগটের রং হালকা হলুদ, খন্ড (Sigment) ১১টি সম্মুখের দিক কিছুটা সূঁচালো এবং পেছনের দিক অর্ধ গোলাকার। ২ বার খোলস বদলায় অর্থাৎ কলপ ৩টি। ম্যাগট অবস্থায় ৭-৮ দিন থাকে। এরপর পিউপাতে রুপান্তরিত হয় পিউপা গড় খয়েরী রংয়ের হয়। ১১টি খন্ড (Sigment) থাকে। পিউপা অবস্থায় ১০-১২ দিন থাকে। পুর্ণাঙ্গ মাছি দেখতে বেশ বড়। এরা ছাই রংয়ের হয়। পুরুষ মাছি স্ত্রী মাছি থেকে বড়। ২-৩ দিন ধরে স্ত্রী মাছি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী মাছি পলুঘরে প্রবেশ করার জন্য অত্যান্ত তৎপর থাকে। গরম কালে এদের জীবন চক্র শেষ হতে ১৭ থেকে ২২ দিন লাগে। শীতের সময় প্রায় ৩০ দিন সময় লাগে।

উজি মাছি রেশম/পলু পোকাকে আক্রমনঃ

- স্ত্রী মাছি পলুর গায়ে ডিম দেয়। ডিমগুলো সাধারণত: পলু দেহের ভাজে ভাজে দিয়ে থাকে। এরা সাধারণত: তেকলপে, সোদকলপ ও রোজের পলুর গায়ে ডিম দেয়। সোদ ও রোজের পলু ছাড়াও চন্দ্রকীতে গুটি করা পলুর গায়ে গায়ে ডিম দেয়।
- উজি মাছি পলুর দেহে ডিম পাড়ার ২-৫ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় একে ম্যাগট বলে। ম্যাগট পলুর ত্বক ভেদ করে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। পলুর ত্বকের উপর ঐ জায়গায় কালো দাগ পড়ে। ঐ দাগ দেখে বোঝা যায় এটা ‘‘মাছি কাটা’’ পলু।
- উজি মাছির ম্যাগট ৫-৮ দিন পলুর দেহে অবস্থান করে এবং পলুর বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ করে বা মৃত্যু ঘটায়।
- তেকলপ, সোদকলপ ও রোজের পলু যদি প্রথম দিকে উজি মাছি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে গুটি করার আগেই পলু মারা যায়। তবে রোজের পলু শেষের দিকে আক্রান্ত হলে পলু গুটি তৈরী করে। গুটি কেটে পরবর্তীতে ম্যাগট বের হয়ে আসে। ঐ গুটি রিলিং কাজে বা ডিম উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। তবে চরকা দিয়ে স্পান সুতা করা যায়।

লক্ষণঃ

- পলুর দেহে যেখানে উজি মাছির ম্যাগট থাকে সেখানে চামড়ার উপর কালো দাগ পড়ে।
- পলুপালনে যারা অভিজ্ঞ তারা ঐ দাগ দেখলেই বুঝতে পারেন পলু মাছি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।
- মাছি আক্রান্ত রেশম গুটি থেকে ম্যাগট গুটি ছিদ্র করে বের হয়ে আসে। ঐ ছিদ্র দেখে মাছি কাটা গুটি সনাক্ত করা যায়।

প্রাদুর্ভাবের সময়:গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

ক্ষতির পরিমান: (০৫-২০)%

প্রতিরোধঃ উজি মাছি দমনে ভৌত ও রাসায়নিক ও জৈবিক দমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

ভৌতঃ

- পলুঘরে যাতে মাছি ঢুকে পলুকে আক্রমন না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পলু ঘরের সাথে মাছি ঘর অবশ্যই থাকতে হবে। এতে মাছি সরাসরি পলু ঘরে ঢোকার সুযোগ পাবে না।
- পলু ঘরের দরজা জানালাতে তারের নেট বা বাঁশের সড়কি দিতে হবে।
- পলু ঘরে কোনভাবে মাছি ঢুকলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে হবে।
- পলু ঘরের দরজা জানালার কোনায় ইউক্যালিপটাস তেলে তুলায় মাখিয়ে রেখে দিলে তেলের তীব্র গন্ধে মাছি ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।
- পলু ঘরের বাইরের জানালা বরাবর মাটির চাড়িতে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রেখে দিলে পলু ঘরে মাছি ঢুকতে গেলে জানালায় ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে মারা যায়।

রাসায়নিকঃ

উজিনাশঃ উজিনাশ প্রতি ১০০ ডিমের জন্য ৮০০-১০০০ মি: লিটার প্রয়োজন। যা শোধ কলপ থেকে একদিন অন্তর অন্তর স্প্রে করে দিতে হয়। এতে মাছির ডিম নষ্ট হয়ে যায় ফলে পলুকে আক্রমন করতে পারে না। উজিনাশ আবিস্কারের জন্য অত্র ইন্সটিটিউট-এর সেরি-রোগতত্ব শাখা, জেবুন নেসা স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

জৈবিক দমনঃ

কোন জীব যখন অন্য ক্ষতিকর জীবকে আক্রমন করে মেরে ফেলে তাকে জৈবিক প্রতিরোধ (Bio-logical control) বলা হয়। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব। যেমন *N. thymus ও Dihinus* নামক Hyper parasite বা ক্ষুদে মাছি দ্বারা উজি মাছির ম্যাগট ও পিউপা নষ্ট করে উজি মাছির আক্রমন থেকে রক্ষা করা যায়।

উজি মাছি রেশম পলুর প্রধান কীটশত্রু। সুতরাং এই মাছি দমনে সর্বদা সতর্ক অবস্থায় থেকে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে করলে উজি মাছি নিয়ন্ত্রণ বা দমন করা সম্ভবপর হবে।

রেশম কীটের কীট শত্রু সমন্বিত দমন ব্যবস্থা

রেশম পোকা নাজুক প্রকৃতির জীব। বিভিন্ন উপায়ে এরা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে যেমন- (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পোটোজোয়া) ইত্যাদি পর্বের জীবাণু। এ সকল রোগ জীবাণু যে কোনভাবে পলুর দেহে প্রবেশ করে পলুকে রোগাক্রান্ত করতে না পারে সে কারণেই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। সফল পলুপালনের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোকে একসাথে প্রয়োগ করাই হল সমন্বিত পদ্ধতিতে রোগদমন ব্যবস্থা।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনাগুলো নীচে আলোচনা করা হলো-

তুঁতপাতাঃ রেশম পোকা তুঁতপাতার মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে। পলুর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ পাতা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি মানসম্পন্ন তুঁতপাতা সরবরাহের জন্য তুঁত জমিতে পরিমিত সার, সেচ, ছাঁটাই, খোঁড় ও নিড়ানী দিতে হবে।

বিশোধনঃ পলুপালনের জন্য পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি বিশোধন অত্যাবশ্যকীয়। বিশোধন না না করে পলুপালন করলে পলু বিভিন্ন রোগে আক্রানত হয়। বিশোধন বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন সূর্যতাপে, গরম পানিতে, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, আগুনের তাপে ইত্যাদি।

সরঞ্জামাদিঃ প্রতিটি চাষীর ডিমের চাহিদা অনুযায়ী পলুপালনের সরঞ্জামাদি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। চাষী প্রতি একটি পলুঘর এবং পরিমান মত ডালা, চন্দ্রকী, জাল ইত্যাদি থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব পলুপালন ব্যাহত হয়।

সহনশীল রেশম জাত পালনঃ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ জাতকেই সহনশীল জাত বলে। রেশম গবেষণাগারে বেশ কিছু উন্নত রেশম জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাত থেকে উন্নত সংকর ডিম উৎপাদন করে সম্প্রসারণ এলাকায় চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা।

চাকী পলুপালনঃ প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থার পলূকে চাকী পলুপালন বলে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এলাকা ভিত্তিক চাকী পলুপালন করে সে এলাকায় বিতরণ করতে হবে। কারণ সফল চাকী পলুপালনই হল ভাল রেশম গুটি উৎপাদনে মূল পূর্ব শর্ত।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশঃ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও আবহাওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব। কারণ উষ্ণ তাপমাত্রা ও নিম্ন আর্দ্রতায় ও ব্যাকটেরিয়া উষ্ণ তাপমাত্রা ও উষ্ণ আর্দ্রতায় ভাইরাস উষ্ণ আর্দ্রতা ও নিম্ন তাপমাত্রায় ছত্রাকজনিত রোগের অনুকুল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। এ কারণে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন এবং পলুপালনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম কানুনগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

রোগমুক্ত ডিমঃ স্ত্রী মথকে খল-নুড়িতে পোষাই করে ৬০০ বিবর্ধনে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে পেব্রিন মুক্ত/রোগমুক্ত ডিম তৈরী করা।

ভৌত প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাঃ

উজি মাছিঃ উজি মাছি যেন পলুর দেহে ডিম দিতে না পারে- এ কারণে পলুঘরের দরজা-জানালা তারের নেট বা বাঁশের সরকি দিতে হবে।

ইঁদুরঃ এরা পলু পোকা ও ডিমের কাগজ ও গুটি কেটে নষ্ট করে ফেলে এর কারণে অনেক ক্ষতি হয়। এ থেকে বাঁচার জন্য ইঁদুর মারা কল ব্যবহার করতে হবে।

টিকটিকিঃ পলুঘরে ঢুকে টিকটিকি পলু খেয়ে ফেলতে পারে এ জন্য যাতে পলূঘরে না ঢুকতে পারে সে জন্য রাস্তা বন্ধ করতে হবে।

পিঁপড়াঃ লাল ও কালো পিঁপড়া পলু পোকার মারাত্বক ক্ষতি করে। এ জন্য সেলফ বা তারের জল-সরা ব্যবহার করতে হবে।

ব্যাঙঃ ব্যাঙ পলুঘরে যাতে ঢুকতে না পারে এ জন্য দরজা বন্ধ রাখতে হবে।

কাক/পাখিঃ অনেক সময় পলুঘরে ঢুকে কিংবা গুটি শুকানোর সময় পাখিরা গুটি মুখে নিয়ে যায়। এই কারণে শুকানোর সময় অবশ্যই নেট ব্যবহার করতে হবে।

রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাঃ

পলু পাউডারঃ পলু পাউডার একটি জীবাণু নাশক পাউডার। এই পাউডার ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ দমনে খুবই কার্যকর। ইহা ভাদুরী বন্দে বা বর্ষাকালে স্যাতসেঁতে আবহাওয়ায় ব্যবহার করা হয়।

ফরমালিন চাপঃ ছত্রাকজনিত চুনাকাঠি দমনে ব্যবহার হয়।

উজিনাশঃ ইহা এক ধরণের কীটনাশক যা উজি মাছির ডিম ধ্বংসে কার্যকর ভুমিকা পালন করে।

ইবিচঃ চকের মত ইবিচ দিয়ে দাগ দিলে আরশোলা ও পিঁপড়া মারা যায়।

ল্যানিরাট/ইঁদুর মারা ফাঁদঃ এগুলো ব্যবহার করে ইঁদুর মারা যায়।

জৈবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাঃ প্রাণী বা পরজীবি দ্বারা অন্য কোন প্রাণী বা পরজীবি ধ্বংস করাকে জৈবিক প্রতিরোধ বলে। এতে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। যেমন; বিড়াল দ্বারা ইঁদুর নিধন।

যেহেতু রেশম পলুর রোগের চিকিৎসায় তেমন সুফল আসেনা সুতরাং সমন্বিত পদ্ধতিতে রোগ-বালাই দমন হলো উত্তম ব্যবস্থা।